নূতন মঙ্গল-এর অভিধায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

ইতিহাসবোধে সমৃদ্ধ হয়ে একজন সমাজসংবেদনশীল কবি যখন মঙ্গলকাব্য লেখেন তখন তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন জীবনবোধের পদধ্বনি শোনার আশা করা যায়। ভারতচন্দ্র এমনটাই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যমধ্যে বারংবার ঘোষিত হয়েছে 'নূতন মঙ্গল'-এর বার্তা। শুধু বার্তা নয়, উদ্বেগও। স্রোতের প্রতিমুখে চলার উদ্বেগ। রাজসভাকবির রাজফরমায়েশ আর প্রচলিত সাহিত্যকর্মকে অঙ্গীকার করেও তার অসারত্ব প্রদর্শন অন্যতর এক প্রতিবাদী জীবনভাবনার সাহচর্যে কখনও কখনও উদ্বেগজনক হয়েছে বৈকি।

আসলে সময়টাই এমন। মধ্যযুগের অস্তিমপর্বে তখন সন্ধিক্ষণের উন্মাদনা ও অস্পষ্টতা। তমসা আর ঊষার সেই ক্রমস্ফুট সময়-বলয়ে তখন একই সঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছে অতীত-ঐতিহ্য আর অনাগত-ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব—বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলতা। এমনই এক যুগসন্ধির প্রতিনিধি কবি তো শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবসাগরে ডুব দিয়ে থাকতে পারেন না। যুগের দাবিতেই তিনি অন্যপথে হাঁটবেন। দায়িত্ব নেবেন নবতম কোনো যুগ-রচনার স্বপ্ন দেখাতে তাঁর পাঠকদের।

স্বপ্ন দেখানো তো সহজ নয়। ঘোরতর অদৃষ্টবাদী একটা জাতি—পুরুষকারকে নিয়তির চেয়ে যে হীনশক্তি মনে করে, মঙ্গলকাব্যের ভক্তিছত্রতলে যে জাতির আত্মবিশ্বাস বিলীয়মান তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখানো সত্যিই কঠিন। সেই কঠিন দায়িত্বকে সম্ভাব্য করে তুলতেই তাই ভারতচন্দ্র বেছে নিলেন সেই পুরোনো ফর্ম মঙ্গলকাব্যের। মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এ-কাব্যের বিষয় ও চরিত্রে, সমাজজীবন চিত্রণে কিংবা আচার-বিশ্বাসের রূপায়ণে খাঁটি বঙ্গীয় সৌরভ। প্রতিবাদী কবি হয়েও বঙ্গীয় ভাব-ভাবনা বা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না তিনি—এ বোধ তাঁর ছিল। আবার এও বলা যায় তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি প্রবহমান জাতি-চরিত্রকে। অনগ্রসর বিজিত হিন্দু, তুর্কি পরাক্রমোত্তর রুদ্ধশ্বাস প্রহর, আর্ত-সঙ্কুল বিপন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ তখন বাঙালি চরিত্রের নিয়ামক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা দৈব-নির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ আর সংস্কারের বীজকে সমূলে উপড়ে ফেলার প্রতিস্পর্ধিতা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার সূচনা হল।

এই অনিবার্যতাকে মেনেই ভারতচন্দ্র তাই মঙ্গলকাব্যের বহু প্রচলিত সংস্কারকে অমান্য করেননি। মঙ্গলকাব্যের বিষয় সংস্থাপন এবং নির্মাণশৈলীতে একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। বিশেষ রকমের পুরাণ-অভিমুখিনতা আছে। বিশেষ দেবতার পূজা-প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নদর্শন থেকে চতুরাঙ্গিক খণ্ড বিভাজন পর্যন্ত সর্বত্র এই পুরাণ-অনুগামিতা। আবার লোক-জীবন-সম্ভূত বিবিধ চেতনাও এর মূলে ক্রিয়াশীল। লোক-ঐতিহ্য মেনে নিয়ে দেবদেবীর বন্দনা থেকে বিষয়বস্তুর বিবিধ বর্ণনা—যেমন নারীদের পতিনিন্দা, সমুদ্রযাত্রা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন লোকসংস্কার, পাকপ্রণালী ইত্যাদিতে প্রবহমান লোকজীবনকেই অনুকরণ করেছে মঙ্গলকাব্য। আর এই সব কিছুর মূলে দৈব আদেশাহত কিংকর্তব্যবিমূঢ় একজন কবির বিশেষ কোনো গোষ্ঠীপোষিত দেবতা বা দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের ঐহিক বাসনা কাজ করেছে।

অন্নদামঙ্গল এই সব শর্ত মেনেই মঙ্গলকাব্য। তবু এর কবি ব্যতিক্রমী। বহিরাঙ্গিক কাহিনীবিন্যাস থেকে অন্তরঙ্গ উপাদান-নির্বাচন—সব ব্যাপারেই মঙ্গলকবিদের ধারায় তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একক। মঙ্গলকাব্যের চতুরাঙ্গিক কাঠামোকে তিনি ভাঙলেন নতুনভাবে। বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ('গ্রন্থসূচনা') ছাড়াও তাঁর কাব্যটি বিভক্ত হল তিনখণ্ডে—(ক) 'অন্নদামঙ্গল' অর্থাৎ দেবখণ্ড (খ) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' অর্থাৎ নরখণ্ডকেন্দ্রিক লৌকিক আখ্যান এবং (গ) 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' বা 'মানসিংহ' অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনী। এইভাবে পুরাণ, রোমান্টিক লোকগাথা এবং ইতিহাসের সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও কবি রচনা করলেন 'নূতন মঙ্গল'। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তবুও তিনটির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রতায় একটা আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। 'গ্রন্থসূচনা' অংশকেও সেই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় সামিল করা যায় এবং যে বিষয়টি এর থেকে স্পষ্ট হয় তা হল, মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারায় আবির্ভূত হলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবী নন, মুখ্য হল সমকাল, সমকালের মানবজীবন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতেই তাঁর এহেন কাব্য-পরিকল্পনা।

'গ্রন্থসূচনা' অংশটি নির্ভেজাল সময়ের দলিল। নবাব আলিবর্দি-অধীনস্থ বঙ্গভূমির বর্গি-আক্রান্ত রূপ এবং আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়-চিত্র এর বিষয়। যে বিপর্যয়ের মূলে ছিল একদিকে বহিরাক্রমণ অন্যদিকে দেশীয় অরাজকতার মিশ্র প্রভাব। আর তারই ফলে এ-কাব্যে বর্গি প্রসঙ্গে দৈবী ভূমিকা এসেছে। মোগল সৈন্য উড়িষ্যা প্রদেশে অত্যাচারকালে শিবের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরেও এসে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলে শিবের পরামর্শক্রমে নন্দী গড় সেতারার বর্গি রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন :

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিব দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

এক তীব্র মুসলিমশাসন-বিরুদ্ধতা এবং শাসকশক্তির প্রতি অনাস্থা পংক্তিগুলির সর্বাঙ্গে। সুতরাং অন্যবিধ এক বিচ্ছিন্ন মানসিকতা নিয়েই ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা দৈবাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভক্তিপ্রবাহে আত্মবিলোপ করে দিতে, যেমন করেছেন বিজয় গুপ্ত প্রমুখেরা :

আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বট তুমি।
যা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি॥ [পদ্মাপুরাণ]

এখানে দেবীবন্দনার ব-কলমে এই ব্যক্তিত্বলোপ কোনো অসহায়তা বা অযোগ্যতার নিদর্শন নয়—আত্মবিশ্বাসের এই বিপর্যয় যেখানে তাদের সুভাষিত কবিকর্মেরই অঙ্গীকৃত—সেখানে ভারতচন্দ্রের নির্দ্বিধ উচ্চারণ :

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়

স্পষ্ট জানালেন দৈবী স্বপ্নাদেশে তাঁর কাব্যরচনা নয়। কোনো অশরীরী বা অ-জাগতিক প্রেরণায় তিনি কলম ধরেন নি। পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে এবং সচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের ইচ্ছায় রচিত হয়েছে তাঁর কাব্য। অবশ্য স্বপ্নপ্রসঙ্গটি মুছে ফেলতে পারেন নি ঐতিহ্য-মান্যতার কারণে। বিপন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কারাকক্ষে দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে বন্দনা করলে দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন—অন্নদার মূর্তি নির্মাণ করে পুজো করলে রাজা বিপন্মুক্ত হবেন :

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।

এবং তারপর,

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায়।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় যেটি তা হল মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবির দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য লিখেছেন। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা গেল দেবী অন্নদা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন ভারতচন্দ্রকে দিয়ে কাব্য লিখিয়ে নিতে এবং বলেছেন ভারতচন্দ্রের মায়ের রূপ ধরে তিনি কবিকে কাব্য লিখতে নির্দেশ দেবেন। অর্থাৎ দেবীর প্রত্যক্ষ স্বপ্নাদেশে নয় মাতার পরিচয়ে দেবীর পরোক্ষ স্বপ্নাদেশে ভারতচন্দ্র কাব্য লিখবেন। মঙ্গলকাব্যের ধারায় এ অবশ্যই নতুন ভাবনা। বিষয়টি মনস্তত্ত্বসম্মতও বটে। কারণ পুত্রর পক্ষে স্বপ্নে মা-কে দেখা দেবীকে দেখার চেয়েও অনেক বাস্তবসম্মত। এতে অবশ্য ভারতচন্দ্রের দায় বেড়েছে আশ্রয়দাতা রাজ-পরিবারের প্রতি। দেবী অন্নদার প্রসাদপুষ্ট আশ্রয়দাতার পরিবার। কবির ছিন্নমূল বিশৃঙ্খল জীবনে প্রতিষ্ঠার মালঞ্চ নির্মাণ করে দিয়েছেন যে রাজা ও তাঁর পরিবার, তাঁরই অনুরোধে রচিত হয়েছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য। ফলে দেববন্দনা-অংশে দেবী বন্দনার পাশে সাড়ম্বরে স্থান করে নিয়েছেন সেই রাজা কবি-কৃতজ্ঞতার ফলকে সুসজ্জিত হয়ে।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করি এ প্রণাম।

এই গতে বাঁধা প্রার্থনার সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

.. ..

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

দেবতার পাশে জায়গা করে নিচ্ছে মানুষ তাঁর কাব্যে। আর তারও ওপরে ব্যক্তির অস্মিতা। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পথে চলা তাই কখনও একঘেয়ে হয়নি তাঁর কাব্যে। অথচ যে পরিস্থিতিতে তাঁর কাব্যচর্চা তাতে পৌনঃপুনিকতাই প্রত্যাশিত ছিল। বিপন্ন দেশ। ক্রান্তিকারী সময়। আবার শুধু সমকালই নয়—ব্যক্তিগত জীবনে একটানা অস্থিরতা আর সঙ্কটও জর্জরিত করেছিল তাঁকে। গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ, কারাবাস, পরান্নভোজন আর নানাবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতাসঙ্কুল সে জীবন-অভিজ্ঞতা। এই জর্জরতার

সম্ভাব্য পরিণাম হতেই পারত জীবন ও জীবন-প্রসূত সাহিত্যে তীব্র এক বিদ্বেষের প্রতিফলন ঘটানো। কিন্তু সেই অনিবার্য সম্ভাবনাকে তিনি অতিক্রম করলেন—সত্যকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন 'প্রমোদের প্রভু'। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

> "এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না আরো জ্বলে উঠেছিল।"

কাব্যপাঠে আমরা দেখি ভারতচন্দ্রের মনের আলো কখনই নিবে যায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে স্ত্রীদের মুখ দিয়ে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভেতরেই আমরা তাঁর মনের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাই, এরকমই একজন স্ত্রী (কবি সম্ভবত নিজের স্ত্রীকেই এখানে মনে রেখেছেন) পতি নিন্দায় মুখর হয়েছেন :

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
নানা শাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

—এই ব্যাজনিন্দা স্বয়ং ভারতচন্দ্রেরই আত্মকথা। স্ত্রীদের মুখে পতিদের নিন্দা শুনে পাঠক দুটো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়—এক, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি; আর দুই, দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হল ব্যবহারিক জীবনের উপর 'আত্মার প্রভুত্ব'। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যে যা অসম্ভব এবং অগ্রাহ্য। নিঃস্ব ভূপতির সন্তান হয়ে মারীগ্রস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তদগত পাঠে পড়ে নিয়েছিলেন সমকালকে। উপলব্ধি করেছিলেন দুঃখের প্রকৃত স্বরূপটি। আর তাই ভাঙন-ধরা গ্রামীণ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম আর রাজনীতির অন্তর্নিহিত মৌল অসত্যের বীজটি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়নি। সেই সূত্র ধরে বর্গিহানা থেকে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়-পর্বে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের সমাসন্ন ঐতিহাসিক নিয়তিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর কাব্যে। এ নিয়তির মৌল সত্য হল অন্নসমস্যা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই আরাধ্যা হলেন দেবী অন্নদা। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর আবির্ভাব এর আগে কখনও ঘটেনি। মন্বন্তর-পীড়িত যুগের চাহিদায় এঁর সৃষ্টি। অন্নের জন্য হাহাকার আর আর্তনাদে বরাভয় দিতে আবির্ভূত হলেন দেবী অন্নপূর্ণা। শিবের 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর তাৎপর্যে এছাড়া অন্য কিছু নেই। তাই এই দেবীর মধ্যে দিয়ে প্রকারান্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অভাবক্লিষ্ট, নিঃস্ব, নিরন্ন এক জাতির প্রতিভূ 'শিব'। নস্যাৎ হয়ে গেছে তাঁর দেবমাহাত্ম্য। উপহাসের শ্লেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাঁর স্বর্গীয় গাম্ভীর্য। ছিন্নভিন্ন করে তাঁকে বিঁধেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক জীবনের চরম

সত্য দারিদ্র্য-কে। আর সেই দুর্বার দারিদ্র্যের তাড়নায় হাভাতে উপবাসী শিব প্রত্যক্ষ করেছেন আসন্ন মন্বন্তরের ভয়াবহ আতঙ্কের ছবি,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তারই ছবি যেন *অন্নদামঙ্গল*-এ সর্বব্যাপ্ত। অন্নপূর্ণা সংহরণ করে নিয়েছেন সমস্ত অন্ন। তার ফলে 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে'।

দেবতা থেকে মানুষ—সবাইকে এক সুতোয় গেঁথেছেন ভারতচন্দ্র। এক সুতোয়, নাকি দেবতার চেয়ে মানুষ উচ্চাসন পেয়েছে তাঁর কাব্যে! বস্ত্রহীনা, অন্নহীনা হয়েও বড়গাছির ব্যক্তিত্বময়ী পদ্মিনী, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করে নির্বিকার জীবনছন্দে অভ্যস্ত হরিহোড় কিংবা লালসাহীন, আর্তিহীন ঈশ্বরীর সংযত চাহিদা অপাঙক্তেয় করে দিয়েছে সযত্নলালিত দেবমহিমাকে। ব্যক্তিস্বার্থের চরিতার্থতা নয়, বিষয় নয়, সম্পদ নয়—কেবল সন্তানের জন্য দুবেলা দু'মুঠো অন্ন প্রার্থনা। জীবনে অনেক পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে এই সীমিত দাবিটুকু মানুষের অহংকে উদ্ভাসিত করল। আসলে এটাই হয়। মহৎ শিল্পীর কাছে সমাজের সত্য, ইতিহাসের সত্য যেমন মূল্যবান মানুষের স্বাধীনতার সত্য—শিল্পীর মুক্তির সত্যও সমান মূল্যবান। এই শিল্পের সত্য রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত চূড়াকে অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে থাকে—ব্যথার সমুদ্র পেরিয়ে স্বর্গীয় মুক্তির অনন্ত আশ্বাসের দিকে প্রসারিত হয়। মঙ্গলকাব্যে ধর্মের আবরণ ঠেলে এ-সত্যের আত্মপ্রকাশ ভারতচন্দ্রের আগে সেভাবে ঘটেনি। মুক্তি সেখানে মনসার পদপ্রান্তে লুটিয়ে থাকা বামহাতের শুকনো ফুলের মতোই অবহেলার সামগ্রী ছিল। ভারতচন্দ্র উদ্ভাসিত করলেন মানুষের সেই ইপ্সিত স্বাধীনতা আর শিল্পের সত্য সম্ভাবনাকে। প্রত্যেক সার্থক শিল্পবস্তুতেই এই দুই সত্য আত্মবিরোধ ডিঙিয়ে সামঞ্জস্যে এসে লীন হয়। ভারতচন্দ্র সেই সমন্বয়ের কবি। 'মঙ্গলকাব্যের প্রথাসর্বস্ব আঙ্গিকচর্চার ঘেরাটোপে বসেও তাই তিনি রচনা করতে পারলেন নূতন মঙ্গল।' যে-কাব্যে ঘোষিত হল মানব মহিমার উচ্চারণ--

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নয় তাহা
আমি যা খেলিতে চাহি
সে খেলা খেলাও হে॥

ঈশ্বরের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্রের এই প্রতিবাদ মানবিক দৃপ্ততায় অনন্য।

কবি কোথা থেকে পেলেন এই মানসিক জোর, ব্যতিক্রমী এই বোধের প্রেরণা? শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানাচ্ছেন : "ভারতচন্দ্র ভঙ্গব্রত মানুষ। এ ধরনের মানুষ কখনো শ্রদ্ধা পান না যদি না তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন তাঁর ব্রতভঙ্গ আসলে নতুন বোধের তাগিদে। এই নতুন বোধের তাগিদটি এসেছে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর সূক্ষ্মতা থেকে।"—অসাম্যপীড়িত সমাজে শৈল্পিক প্রতিবাদের জন্ম তো এই সূক্ষ্মতা থেকেই সম্ভব হয়। অনাচারগ্রস্ত ধর্মাচার, অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থা, প্রথাসর্বস্ব সাহিত্যকাঠামো এমনকি গতানুগতিক কাব্যভাষার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদী। পুরাণ, আগম, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি তাঁর আত্মগৌরবের কারণ হলেও তাকে তিনি সংযত করতে জানতেন। কাজেই স্পষ্টভাষণে জানালেন 'কাব্যভাষা' কেমন হওয়া উচিত। তাঁর কথায় :

পড়িয়াছি যেই মতো লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

স্বভাবতই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত—'যে হোক সে হৌক ভাষা কব্যরস লয়ে।'

দ্বিধাহীন উচ্চারণে গতানুগতিক কাব্যভাষার অসারতাই প্রমাণিত হচ্ছে। আর সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনার তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ যার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন :

> "সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়।—আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসম্বরণে।"

আত্মসম্বরণ কি আত্মচৈতন্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয় অন্তত যে সম্বিতের কথা ভারতচন্দ্র বললেন :

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদাসুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদাদুখী॥

মেনে নেওয়া গেল প্রতিবাদী। কিন্তু প্রশ্ন হল কোথা থেকে তিনি পেলেন প্রতিবাদেব এমন অত্যাধুনিক উপকরণ। তীব্রতার বদলে রমণীয়তা, আঘাতের বদলে কৌতুক, প্রচারের বদলে আত্মসমালোচনার অভিনব শৈলী। একজন বাজসভাকবির পক্ষে কাব্যশৈলীর এই ভঙ্গি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। মেনে নেওয়া যায় তিনি ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান। কিন্তু আত্মোপলব্ধির জন্য একজন সুপটু পদপ্রদর্শক তো প্রয়োজন যাঁর আলোয় আলোকিত হবে কবির উন্মুখ মনস্বিতা। সেদিক থেকে ভারতচন্দ্রের ওপর ফার্সি ও পাশ্চাত্যসংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখ করা যায়। তাঁর প্রথম যৌবন কেটেছিল ফরাসিদের আবাস চন্দননগরে অর্থাৎ ফরাসডাঙায়। বাল্যকাল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষটি এসে উপস্থিত হন রোমান্সপ্রবণ ফরাসিদেব সংস্পর্শে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুবীর সহায়তায়। গ্রহণক্ষম অন্তরে সোৎসাহে ধাবণ কবতে থাকেন ফরাসিবাহিত প্রাতীচীর প্রেম, সৌন্দর্য ও দর্শনের 'কনসেপ্ট'। বদল ঘটে যায় জীবনদর্শনে। তথাকথিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আধুনিক 'আর্ট'-এর রঙ লাগে। নিঃসন্দেহে আর্টের এই নিপুণ প্রয়োগ সর্বাধিক ঘটেছে *অন্নদামঙ্গল*-এর গর্ভকাব্য-*বিদ্যাসুন্দর*-এ।

আসলে ভারতচন্দ্র নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। মঙ্গলকাব্য ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য তাঁর সাহিত্যভাবনায় চরম পরিণতি লাভ করেছে। এমনকি কবিকঙ্কণের কবিত্বও সেই অজানা অভাবিত রহস্যময়তাকে ছুঁতে পারেনি। সমগ্র মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্য ধীরে ধীরে যে উপাদান সংগ্রহ করেছিল যাকে সে এখানে-ওখানে আংশিক শিল্পরূপ দিয়েও পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি পায়নি, তাই যেন চূড়ান্ত সৌন্দর্যলাভের আশায় ভারতচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কিংবা এ যেন জাতির সেই মগ্নচৈতন্য, দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত থাকতে থাকতে এক সময় কোনো যুগসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে ব্যক্তিবিশেষে সংহত হয়ে 'সেই জাতিরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্যশক্তিরূপে প্রস্ফুরিত' হয়ে পড়ল। যুগসন্ধির সেই নায়ক ভারতচন্দ্র। কিন্তু শুধু সন্ধিক্ষণেরই নয়। কারণ-যুগ পরিবেশ তো দূরে সরে যায় দ্রুত। ব্যক্তি আর ঘটনাও হারিয়ে যায়। থেকে যায় সৃষ্টির অমরাবতী, মহৎ স্রষ্টার উত্তরাধিকার। পরবর্তী প্রজন্ম সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে মিলিয়ে দেয় নবীন যুগের বহতা স্রোতে। পরবর্তীকালের

বাংলা সাহিত্য তাই দৈবী ঐতিহ্যের ধারাকে অস্বীকার করে স্বীকার করে নিল অন্নদামঙ্গল-এর মানবচেতনাকে। সন্ধিক্ষণের বিশেষ সময়পর্বের হয়েও কবি ভারতচন্দ্র তাই হয়ে গেলেন চিরন্তন। তিনি তিমির বিলাসী নন। বরং তিমিরান্ধ্র প্রতিবেশে বসে তাঁর তিমিব হননের সাধনা। মানুষের মুক্তি চান তিনি, সে মুক্তি শুধু তামসিক দেশকালের হাত থেকে নয়, মানুষের অজ্ঞাত-অন্ধকারতম অবচেতনেব কর্তৃত্ব থেকেও। এর নাম শিল্পেব মুক্তি। এই মুক্তির স্বপ্নই শিল্পে সঞ্চারিত করে দিলেন ভারতচন্দ্র। আর তাতেই বাঞ্ছাফলসুখ লাভ করার আনন্দে গর্বিত হল বাঙালির পূর্বপুরুষ, ঈশ্বরী পাটুনি। সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখার প্রাগৈতিহাসিক কামনা আধুনিক পাঠকের বিশ্লেষণী চেতনার আলোয় শাশ্বত রূপ পেল। আজকের পাঠক বুঝল যে এ-দুধভাতের চাহিদা আসলে নিছক পেট ভরাবার দায় থেকে আসেনি। এসেছে উত্তরাধিকার আর পরম্পরাসৃজনের তাগিদে। যে পরম্পরা 'প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে' 'শোচনীয় কালের বিপাকে' নিজেদের সান্দ্র বিশ্বাসকে হারিয়েও সুচেতনার বোধে পূর্ণ হয়ে স্বীকৃতি জানাচ্ছে যুগসন্ধিক্ষণের এই অগ্রজ শিল্পীকে।